International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

সহজযানী বৌদ্ধধর্মে কামপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বায়নের সাধনা

ড. তপোব্রত ভাদুড়ি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়

সারাংশ –

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে 'সহজযান' একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যময় অধ্যায়। থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের কঠোর অনুশাসন ও কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করে, তান্ত্রিকতার প্রভাবে উদ্ভূত এই শাখা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে দমনের পরিবর্তে তাকেই আধ্যাত্মিক উত্তরণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সহজিয়া সাধকদের মতে, 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়'-এর মিলনেই পরম নির্বাণ বা 'সহজ মহাসুখ' লাভ করা সম্ভব। শূন্যতা ও করুণার অপূর্ব সমন্বয় বৌদ্ধ সহজযানকে এক অনন্য দার্শনিক ও সাধনাগত উচ্চতা দান করেছে, যেখানে মানবদেহকেই পরম সত্যের আধার রূপে বিবেচনা করা হয়।

সূচক শব্দ – থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম, হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, প্রজ্ঞা, উপায়, সহজ মহাসুখ, চর্যাগান

ভূমিকা –

তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন নারী-পুরুষের যুগলসাধনার মধ্য দিয়ে কামপ্রবৃত্তির পরিশুদ্ধি ও ঊর্ধ্বায়ন ঘটিয়ে শিবশক্তির মিলন-জনিত আনন্দময় অদ্বয় অনুভূতি লাভ করবার কথা বলা হয়েছে, বৌদ্ধ সহজিয়ারাও তেমনি মানুষের সহজাত জৈবপ্রবৃত্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে দুটি পৃথক তত্ত্বের সম্মিলনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা পরম নির্বাণ লাভ করবার কথা বলেছেন। বৌদ্ধদের এই যামলতত্ত্বের নাম 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়'। এদের মধ্যে প্রজ্ঞা বা শূন্যতা স্ত্রীতত্ত্ব আর উপায় বা করুণা পুরুষতত্ত্ব। [১] এই দুটি তত্ত্বের সমন্বয়-প্রসূত বাপথাতীত অনুভূতির নাম 'সহজ মহাসুখ'। [২] বলাবাহুল্য, বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত প্রব্রজ্যাধর্মের মূল আদর্শ থেকে সরে এসে নির্বাণলাভের পন্থা সম্পর্কে সহজিয়াদের এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার অন্তরালে তন্ত্রের নিগূঢ় ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত, থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিবর্তনের ধারায় মহাযানী মতবাদের সঙ্গে তন্ত্রের সংমিশ্রণের ফলেই কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রযান বা মন্ত্রনয় শাখার উৎপত্তি হয়। মন্ত্রযানের তিনটি পর্যায় – বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান।

পর্যালোচনা - এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোনো কোনো অবাচীন বৌদ্ধতন্ত্রে দাবি করা হয়েছে, বুদ্ধ নিজেই নাকি তাঁর ধর্মে মন্ত্র- মুদ্রা-মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক উপাদানগুলির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্যের নিরিখে এমন দাবি আদৌ ইতিহাস– সম্মত নয়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'Obscure Religious Cults' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, '... we find no conclusive evidence in any early record of Buddha's sanction to Tantricism'। [৩] তিনি আরও জানিয়েছেন, '...it will perhaps be wrong to suppose that Tantricism was introduced into Buddhism at any particular time by any particular man.'। [৪]

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রচারিত মূল মতবাদ ও তার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের ইতিহাসটি সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যেতে পারে। বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্ম ছিল নীতিবোধের ধর্ম। এর ভিত্তি হল চারটি আর্যসত্য – দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে, দুঃখনিবৃত্তির উপায়ও আছে। বুদ্ধ বলেছিলেন, মানুষের যাবতীয় দুঃখ আর অশান্তির মূল কারণ হল তার অতৃপ্ত ভোগবাসনা বা 'তন্হা' (তৃষ্ণা)। এই বিষয়তৃষ্ণার অবসান ঘটাতে পারলেই দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব। বুদ্ধদেবের মতে সেই অবস্থার নাম 'নির্বাণ'। 'নির্বাণ' লাভ করবার জন্য বুদ্ধদেব মোট আটটি উপায় নির্দেশ করেছেন। এক কথায় তাকে বলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এগুলি হল – সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। এদের মোট তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় – শীল, চিত্ত আর প্রজ্ঞা। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা – এই তিনটি বিষয় শীলপালনের মধ্যে পড়ে। সম্যক বাক্যের অর্থ মিথ্যাভাষণ, কর্কশ বাক্য, পরনিন্দা ও বৃথালাপ বর্জন করা; সম্যক কর্মের অর্থ অহিংসা, অস্তেয় ও ব্রহ্মচর্য; সম্যক জীবিকা বলতে বোঝায় সৎ পথে থেকে জীবনধারণ করা। এক কথায় বলতে গেলে শরীর ও বাক্যকে সংযত করাই শীলপালনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ঠিক সেইরকমভাবেই 'চিত্ত'-এর লক্ষ্য মনঃসংযম। চিত্তের তিনটি দিক – সম্যক স্মৃতি, সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক সমাধি। সম্যক স্মৃতি হল, মনের মলিন চিন্তারাশির ওপর গভীর মনঃসংযোগ; সম্যক ব্যায়াম হল, সেইসব খারাপ চিন্তাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে মনকে পবিত্র করার চেষ্টা; আর সম্যক সমাধি কথাটির অর্থ, শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুশাসনগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। বুদ্ধদেবের মতে, শরীর-মন আর বাক্য শুদ্ধ ও সংযত হলেই সাধকের মধ্যে 'প্রজ্ঞা'-র স্ফুরণ হয়। প্রজ্ঞার মধ্যে পড়ে সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প। সম্যক দৃষ্টি লাভ করলে জগৎ ও জীবনের সত্য স্বরূপটি মানুষের চোখে ধরা পড়ে। আর সম্যক সংকল্পের উদয় হলে মানুষ বুঝতে পারে, মায়ামোহ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকেই নিজের দুঃখ নির্মূল করতে হবে। [৫]

দুঃখের বিষয়, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ শ্রমণদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় বৌদ্ধ সংঘ অচিরেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ নব্যপন্থীরা রক্ষণশীল প্রাচীনদের মতবাদকে অবজ্ঞাসূচকভাবে 'হীনযান' নামে অভিহিত করেন এবং নিজেদের মতাদর্শকে 'মহাযান' আখ্যা দেন। হীনযানীদের দুটি ভাগ ছিল – শ্রাবকযান ও প্রত্যেকবুদ্ধযান। শ্রাবকযানীরা বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধ একজনই ছিলেন; বুদ্ধত্বলাভ আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিই ছিল এঁদের ধর্মজীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। অন্যদিকে, প্রত্যেকবুদ্ধযানীরা মনে করতেন, 'বুদ্ধ' কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়; 'বুদ্ধ' একটি অত্যুচ্চ অবস্থা এবং প্রতিটি জীবের পক্ষেই অভিসম্বোধি লাভ করা সম্ভব। তবে আত্মমোক্ষই ছিল এঁদের চরম লক্ষ্য। ধর্মচেতনা ও জীবনাদর্শের দিক থেকে মহাযানীরা ছিলেন অনেকখানি উদারপন্থী। শুধুমাত্র নিজের জন্যই বুদ্ধত্বলাভের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ছিল না। তথাগত যেমন বুদ্ধত্বলাভের আগে জীবকল্যাণের জন্য জন্ম জন্ম ধরে বোধিসত্ত্বরূপে আবির্ভূত হয়ে অকাতরে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, মহাযানীরাও তেমনিভাবে জগতের মঙ্গলের জন্য জীবন বিসর্জন করাকে বুদ্ধত্বলাভের তুলনায় শ্রেয়স্কর বলে মনে করতেন। অর্থাৎ মহাযানীদের উদ্দেশ্য ছিল আগে সর্বজীবের আধ্যাত্মিক কল্যাণ, তারপরে নিজের মুক্তি। [৬]

এই পরহিতব্রতী, জীবদুঃখকাতর মহাযানীরাই সংসারবিরক্ত, শুষ্কহৃদয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রচারিত 'করুণা'র আদর্শটি নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে শূন্যবাদীদের অনুপ্রেরণায় 'করুণা'-র সঙ্গে সঙ্গে 'শূন্যতা'-র তত্ত্বটিও মহাযানী বৌদ্ধদের কাছে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেতে থাকে। 'করুণা' হচ্ছে ভবযন্ত্রণাদগ্ধ জীবের অবিদ্যাবন্ধন-মুক্তির জন্য সমবেদনা- প্রসূত ব্যাকুলতা, আর 'শূন্যতা' হল প্রাতিভাসিক জগতের মিথ্যাত্ববোধ। মহাযানপন্থীরা পারিভাষিক অর্থে করুণাকে 'উপায়' এবং শূন্যতাকে 'প্রজ্ঞা' শব্দেও অভিহিত করতেন। মহাযানী মতবাদের সঙ্গে তন্ত্রের যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকে তন্ত্রের শিব-শক্তির আদর্শে করুণা বা উপায় হেরুক, বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্ব নামক পুরুষতত্ত্ব এবং শূন্যতা বা প্রজ্ঞা নৈরাত্মা বা নৈরামণি নামক স্ত্রীতত্ত্বরূপে কল্পিত হতে থাকে।

বজ্রসত্ত্বের উপাসনার সূত্র ধরেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বজ্রযান বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীকালে বজ্রযান কালচক্রযানে রূপান্তরিত হয় এবং এই পরিবর্তনের ধারাপথ বেয়েই আরও পরে সহজযানের আবির্ভাব ঘটে।

বজ্রযান থেকে কালচক্রযান হয়ে সহজযানের অভিমুখে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশের স্তরপরম্পরাটি বিশ্লেষণ করে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থটিতে দেখিয়েছেন, গোড়ার দিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধনপদ্ধতিতে নরনারীর যৌনমিলনের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত গৌণ হলেও পরবর্তীকালে মন্ত্র-মুদ্রা-মণ্ডল বা অভিষেক ক্রিয়ার তুলনায় যৌনযৌগিক প্রক্রিয়াটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'It is to be noticed that in the earlier phase of Tantric Buddhism emphasis was laid generally on the elements of Mantra, Mudrā, Mandala, Abhiseka (initiation and the ceremonies associated with it), etc.; but gradually the sexo-yogic practice also began to be referred to. In course of evolution, however, the sexo- yogic practice came to be held as the most important esoteric practice for the attainment of the final state of supreme bliss, all the other practices and ceremonies being held as preparatory accessories. the five accesso- ries of wine (madya), meat (mamsa), fish (matsya), woman (?) (mudra) and sexual intercourse (maithuna) gradually made their way into Buddism.' [৭]

বৌদ্ধদের তন্ত্রোপাসনায় শেষোক্ত পাঁচটি বিষয়ের ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে তিনি পুনশ্চ উল্লেখ করেছেন, 'We do not, however, find any direct mention of the Pañca-ma-kāras in the Buddhist Tantras; but we find sporadic mention of wine, fish, meat, etc. and much of Mudrā and sexual intercourse. We also find frequent reference to the Pañca-kāma-guṇa or five objects of desire through the enjoyment of which perfection can be attained.' [৮] সহজ সাধনায় নরনারীর যৌনমিলনের ভূমিকা একান্ত অপরিহার্য বলে বৌদ্ধ সহজিয়াদের বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে প্রজ্ঞোপায়যোগকে অনেক সময় 'মহারাগনয়' বা 'মুদ্রা-কুন্দুরু যোগ' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। 'মহারাগ' শব্দের অর্থ যৌনবাসনা আর 'নয়' মানে মার্গ। সহজিয়া সাধকরা মৈথুন-আনন্দকে যৌগিক প্রক্রিয়ায় সংযত করে সহজাত কামপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বায়নের মধ্য দিয়ে তুরীয় আনন্দ লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছেন বলে তাঁদের সাধনপন্থাকে বলা হয়েছে 'মহারাগনয়'। [৯]

'মুদ্রা-কুন্দুরু যোগ' কথাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে 'মুদ্রা' একটি পারিভাষিক শব্দ। 'মুদ্রা' বলতে সাধারণ অর্থে বোঝায় বিশেষ ধরনের অঙ্গুলি-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সূচিত কতকগুলি প্রতীক বা চিহ্ন, কিন্তু আভিপ্রায়িক অর্থে 'মুদ্রা' মানে পার্থিব জগতের 'যোষিৎ'। চর্যাগানের 'নির্মলগিরা' টীকায় 'কুন্দুরু' শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য মুনি দত্ত বলেছেন 'দ্বীন্দ্রিয় সমাপত্তি যোগ' অর্থাৎ ভগ-লিঙ্গের মিলন। সুতরাং 'মুদ্রা-কুন্দুরু যোগ' বলতে যে নরনারীর দেহমিলনকেই বোঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। [১০] স্থূল অর্থে বিষয়টি অসামাজিক বটে। কিন্তু সহজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করলে বুঝতে পারা যাবে, এই বহিরঙ্গ বিচার একেবারেই অমূলক।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের গুহ্যসাধনার অন্তরালবর্তী জীবনদৃষ্টির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট এক গবেষক যথার্থভাবেই লিখেছেন: "সকল শাস্ত্রে ক্ষুধা এবং যৌনক্ষুধাকে মানুষের আদিমতম বৃত্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং এইসব বৃত্তিকে অবদমনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির এই ক্রমাগত নিরোধের দ্বারা মানুষ শুধু অসুস্থ ও স্নায়ুরোগগ্রস্ত হয়– তা মানুষকে তার স্বাভাবিক ধর্মপথে চালিত করে না; যা মানুষকে তার সহজধর্ম-পথে চালিত করে না, তা মানুষের স্বরূপোপলব্ধির কোন সাহায্যও করে না।

সহজিয়াদের মতে, মানবের সহজাত বৃত্তিগুলিই সত্যদর্শনের শ্রেষ্ঠ সহায়ক– সেজন্য এই পথই 'সহজ' পথ। অন্য ধর্মসম্প্রদায় অপেক্ষা সহজিয়াদের নৈতিক দৈন্যের পরিচায়ক এটি নয়। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় যেখানে সহজাত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চেয়েছেন, সহজিয়াগণ সেখানে তাদের উচ্ছেদ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলে তাদের পরিবর্তন ও উন্নয়ন করতে চেয়েছেন।" [১১]

সহজিয়া সাধনায় নরনারীর দেহসম্ভোগ যাতে লক্ষ্যবিচ্যুত হয়ে ব্যভিচার ও যৌনবিকারে পর্যবসিত না হয়, সেজন্য শাস্ত্রকাররা সর্বাগ্রে সাধকের দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির ওপরে জোর দিয়েছেন। সাধকের এই আত্মপরিশুদ্ধির একমাত্র উপায় সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে ষড়ঙ্গ যোগের অভ্যাস। যোগসাধনার ছটি অঙ্গের নাম– প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অনুস্মৃতি ও সমাধি। স্বভাবত বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে রূপরসাদি বাহ্যবিষয় থেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে চিত্তে বিলীন করার নাম 'প্রত্যাহার'। তারপর বাহ্যবৃত্তি-রহিত অন্তর্মুখ চিত্তের দ্বারা পঞ্চবুদ্ধাকারে সকল ধর্মের ভাবনার নাম 'ধ্যান'। ধ্যানাসনে সংযত হয়ে উপবেশনের অভ্যাস হয়ে গেলে ললনা-রসনা নাড়ীদুটিকে নিরুদ্ধ করে প্রাণবায়ুকে নিশ্চল করার নাম 'প্রাণায়াম'। স্থির প্রাণবায়ুকে নাভিদেশে অবস্থিত বিন্দুস্থানে একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করে 'চণ্ডালী' বা কুলকুণ্ডলিনীকে প্রজ্বলিত বা উদ্দীপিত করার নাম 'ধারণা'। ওই অবস্থায় চিত্ত সম্যকভাবে বিকল্পশূন্য হলে তাকে বলে 'অনুস্মৃতি'। অনুস্মৃতির প্রগাঢ় অবস্থাই 'সমাধি' – সমাধি অবস্থায় প্রাতিভাসিক জগতের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে এবং সাধক অভিসম্বোধি লাভ করেন। [১২] সহজ সাধনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই ষড়ঙ্গ যোগের যথাযথ অনুশীলনের জন্যই যে শুধু গুরুর সহায়তা প্রয়োজন, তাই নয়; অভিজ্ঞ গুরুর সক্রিয় অভিভাবকত্ব ছাড়া পরবর্তী যৌনাচারের জটিল প্রক্রিয়াতেও পদে পদে নরকের পঙ্কিল আবর্তে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। এই জন্য 'চর্যাগীতিকোশ'-এর প্রথম গানটিতেই আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বিশেষ গুরুত্বসহকারে বলেছেন, 'গুরু পুচ্ছিঅ জান'।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রজ্ঞোপায়যোগের সার কথা হল, নরনারীর মৈথুনের মধ্য দিয়ে প্রথমে সংবৃতি বোধিচিত্তের উৎপাদন, তারপরে তার ধারণ ও শোধন এবং সবশেষে তার উদ্গতির মাধ্যমে পারমার্থিক বোধিচিত্ত রূপে তার পরিবর্তন সাধন। 'বোধিচিত্ত' এখানে সম্পূর্ণভাবেই পারিভাষিক শব্দ। স্থূল অর্থে 'বোধিচিত্ত' হল শুক্র বা বিন্দু, সূক্ষ্ম অর্থে 'বোধিচিত্ত' মানে কামপ্রবৃত্তি বা যৌনবাসনা। বৌদ্ধরা এই সমগ্র সাধনপ্রণালীটিকে দুটি ক্রমে বিভক্ত করেছেন– উৎপত্তিক্রম আর উৎপন্নক্রম। তাঁদের কল্পনায়, উৎপত্তিক্রমে 'মুদ্রা' বা সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে সাধকের দেহসঙ্গমের ফলে প্রথমে মস্তকে অবস্থিত উষ্ণীষকমলে সংবৃতি বোধিচিত্ত উৎপত্তিলাভ করে এবং ক্রমে কণ্ঠে অবস্থিত সম্ভোগচক্র ও হৃদয়ে অবস্থিত ধর্মচক্রের মধ্য দিয়ে নিম্নাভিমুখে ক্ষরিত হয়ে অবশেষে তা নাভিতে অবস্থিত নির্মাণচক্রে উপনীত হয়। আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, উৎপত্তি ক্রমের একেবারে অন্তিম অবস্থায় সাধকের বোধিচিত্ত বা বিন্দু, 'বজ্রমণি' বা পুংজননেন্দ্রিয়ের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে 'অগ্রভাগ পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু তথাপি স্খলিত হয় না।' [১৩] এক কথায়, উৎপত্তিক্রম হচ্ছে অবরোহক্রম।

বিপরীত পক্ষে, উৎপন্নক্রম হল আরোহক্রম। উৎপন্নক্রমে সাধক অস্খলিত বোধিচিত্ত বা বিন্দুকে আবার বিক্ষুব্ধ করে নির্মাণচক্র থেকে অবধূতিকামার্গে বিপরীতমুখে চালিত করে ধর্মচক্র ও সম্ভোগচক্র অতিক্রম করে উষ্ণীষকমল বা মহাসুখচক্রে স্থাপন করেন। তখন সংবৃতি বোধিচিত্তই পারমার্থিক বোধিচিত্তে রূপান্তরিত হয়ে সাধকের মধ্যে সহজানন্দের বিস্ফুরণ ঘটায়। এম. ই. কারেল্লি তাঁর সম্পাদিত 'সেকোদ্দেশ টীকা' বইয়ের ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'After the ... former ceremonies corresponding to Utpattikrama, which are performed by the Sisya in connection with his Mudra, so that Bindu sinks down to Vajramani without going forth... the disciple drives back the flow of vital energy to his forehead in order to achieve sublimation.' [১৪] শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই বক্তব্যটি সর্বতোভাবে সমর্থন করে বলেছেন, 'বোধিচিত্তের দুই রূপ– সাধারণ মিলনের জৈবিক ধারার ক্ষরণে যে স্থূল আনন্দ, তা সংবৃত বোধিচিত্ত

এবং ক্ষরণমুখী জৈবিক ধারাকে উজানে চালিত করে যে স্থির চরমানন্দ– তা বিবৃত বা পারমার্থিক বোধিচিত্ত নামে অভিহিত। সংবৃত বোধিচিত্ত সংবৃত সত্য বা অনিত্য সত্যের প্রতীক। পারমার্থিক বোধিচিত্ত পরমতত্ত্বের প্রতীক। সহজিয়াদের লক্ষ্য প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনে বোধিচিত্তের উৎপাদন এবং তৎপরে সংবৃত বোধিচিত্তকে পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিবর্তিত করা।' [১৫]

আপাতভাবে শুদ্ধাচারী সামাজিকের দৃষ্টিতে সহজিয়াদের গুহ্য সাধনকৌশলটিকে কুরুচিপূর্ণ ও জুগুপ্সা-উদ্রেককারী বলে মনে হলেও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মর্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধনার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধনপন্থা ও সাধ্যবস্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সুচিন্তিত মূল্যায়নগুলি খেয়াল রাখলে বুঝতে পারা যাবে, নরনারীর উৎকট রিরংসাবৃত্তিকে শাস্ত্রসম্মত করে মানুষের কুৎসিত মনোবিকারকে ধর্মের ছাড়পত্র দেওয়া সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল না। মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তির দুর্দমনীয় শক্তিকে কল্যাণকর লক্ষ্যে পরিচালিত করে ইন্দ্রিয়বাসনা-তাড়িত মর্ত্যমানবকেই তাঁরা দেবমানবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, আমাদের মোহমল-লিপ্ত প্রেমচেতনার পরিশীলন ও উদ্‌গমনের মধ্য দিয়েই আমরা পরম সত্যের সন্ধান লাভ করে অখণ্ড দিব্যানন্দের অধিকারী হতে পারি।

এই প্রসঙ্গে গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর পূর্বোক্ত বইটিতে লিখেছেন, 'বিন্দু স্বভাবতঃ মলযুক্ত বলিয়া উহা অধোগতিসম্পন্ন। ঐ অশুদ্ধ বিন্দুকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ সংবৃতি বোধিচিত্ত নামে অভিহিত করেন। অশুদ্ধ বিন্দুর... দ্বারা... বুদ্ধত্বলাভ সুদূরপরাহত। সেইজন্য সর্বপ্রথমে শোধন-শক্তি ও নিরোধশক্তি দ্বারা বিন্দুর অধোগতি রোধ করা প্রয়োজন।' [১৬] 'বিন্দুর ঊর্ধ্বগতির সম্পাদনের ফলে কায়সাধন সম্পন্ন হইয়া থাকে।' [১৭] 'ষট্‌চক্রভেদের ন্যায় উত্থাপনক্রিয়া অতি কঠিন। ... ক্ষুব্ধবিন্দুর ঊর্ধ্বগমন পথে ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ আস্বাদিত হইয়া থাকে। বিন্দুর অধোগমনেও আনন্দের অভিব্যক্তি অবশ্যই হয় কিন্তু তাহা অস্থায়ী এবং মলিন বলিয়া উহা ত্যাজ্য। বিন্দুর অধোগতির ফলে যেরূপ কামদেহের উৎপত্তি হয় তদ্রূপ উহার ঊর্ধ্বগমনে দিব্যদেহ প্রকটিত হইয়া থাকে। [১৮] সুতরাং মত ও পথ যাই হোক না কেন, চিৎপ্রকর্ষ ও জীবন্মুক্তি লাভই যে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

উপসংহার - পরিশেষে বলা যায়, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা কেবল বাহ্যিক আচার-সর্বস্বতা বা স্থূল যৌন কৃচ্ছ্রতা নয়, বরং তা ছিল ইন্দ্রিয়জ বাসনাকে বিশুদ্ধ করে পারমার্থিক আনন্দে রূপান্তরিত করার এক নিগূঢ় প্রক্রিয়া। আপাত দৃষ্টিতে এই সাধনপন্থাকে কুরুচিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু এর মূল লক্ষ্য ছিল গুরুর নির্দেশে 'বোধিচিত্ত' বা 'বিন্দু'-র ঊর্ধ্বায়নের মাধ্যমে জীবদ্দশাতেই মুক্তি বা 'জীবন্মুক্তি' লাভ করা। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বা গোপীনাথ কবিরাজের মতো গবেষকদের দৃষ্টিতে, সহজিয়া সাধকেরা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে অস্বীকার না করে তাকেই কল্যাণের পথে পরিচালিত করে মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এই গভীর জীবনদর্শন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

সূত্রনির্দেশ-

1. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা/বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা', প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ভারবি, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ৫০
2. পূর্বোক্ত
3. Shashibhusan Das Gupta, 'Obscure Religious Cults', Third edition - Reprint, Calcutta, Firma KLM Private Limited, p. 19
4. Ibid
5. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য', প্রথম প্রকাশ–পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪০৪, পৃ. ১৮-১৯

6. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, ‘বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম’, দ্বিতীয় শৈব্যা সংস্করণ, কলিকাতা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৯-১০
7. Shashibhusan Das Gupta, ‘Obscure Religious Cults’, p. 23
8. Ibid, Footnote No. 1
9. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ‘চর্যাগীতির ভূমিকা’, দ্বিতীয় সংস্করণ – পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, অগ্রহায়ণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬০
10. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
11. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ‘বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা’, পৃ. ৪১
12. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ‘চর্যাগীতির ভূমিকা’, পৃ. ৭৩
13. মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ, ‘তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত’, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ৪১
14. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ‘চর্যাগীতির ভূমিকা’, পৃ. ৭৯, পাদটীকা-১
15. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ‘বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা’, পৃ. ৫০
16. মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ, ‘তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত’, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৪
17. পূর্বোক্ত
18. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩